যুগান্তর

তারিখ 02 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ড. এস এম মুজিবুর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও খসড়া নীতিমালা

শিক্ষা

সাম্প্রতিককালে দেশের দৈনিকগুলো ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যানের বরাত দিয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছাপিয়েছে। সংবাদটির মূল বিষয় হল : পাবলিক বা গণবিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকরির বিধিমালায় কোন বৈষম্য থাকবে না, বরং এগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হবে, যাতে সব গণবিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন একই সমতলে থাকে। উদ্যোগটি প্রশংসার দাবি রাখে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিয়াত্তরের অধ্যাদেশকে যেভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে গেল তিন যুগ ধরে, তাতে নতুন কোন বিধিমালা তৈরি করার সময় সবাইকে মনে রাখতে হবে যাতে নিয়মের ফাঁকফোকর দিয়ে শিক্ষক সমিতিগুলো, প্রশাসন ও স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিধিমালার অপব্যবহার না করতে পারে।

আমি নানা পর্যায়ে বলতে চেষ্টা করেছি : তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ জাতির একটি অমূল্য সম্পদ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষক এই অধ্যাদেশকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন। গেল পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস বলে, তিয়াত্তরের অধ্যাদেশের ফাঁকফোকরগুলো ব্যবহার করে সাধারণ শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নন, এমন ব্যক্তিরা উপাচার্য পর্যন্ত হয়েছেন। অযোগ্য এসব লোক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের শীর্ষে থেকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর পদলেহনে যে সময় ব্যয় করেছেন, তার সিকিভাগও ব্যয় করেননি শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণার রূপরেখা তৈরি করতে। বরং দলীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন দলীয়ভাবে। বিশেষ করে গেল ১৫ বছরে 'গণতন্ত্রের' যুগে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই গুণাবলী ও যোগ্যতার চেয়ে দলবাজি প্রাধান্য পেয়েছে। তখন অনেকেই বলতেন, সঠিক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বদলে 'ভোটার' নিয়োগ পাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

আজকের পরিবর্তিত হাওয়ায় চিন্তা-ভাবনার একটা সুযোগ এসেছে, আর এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। খবরে যতটুকু বুঝতে পারছি, এরই মধ্যে ইউজিসি'র খসড়া নীতিমালা হয়তো মতামতের জন্য যথাস্থান ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে পৌঁছে গেছে। এদের মতামতের আলোকেই তৈরি হবে চূড়ান্ত নীতিমালা, দেশের একজন করদাতা হিসেবে এবং দেশে ও দেশের বাইরে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি কিছু ব্যক্তিগত মতামত পেশ করতে চাই। আমার মতামত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের পদোন্নতি বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে।

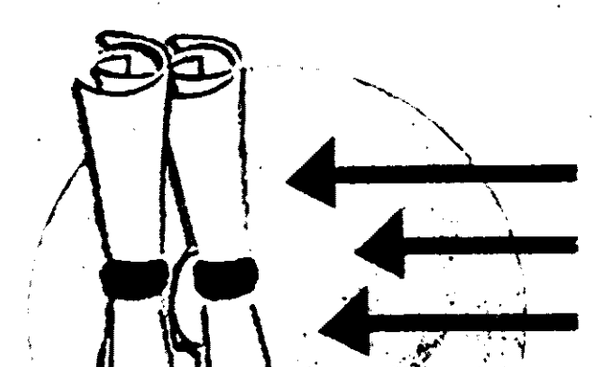

খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে (খবরের ভাষ্যে), সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী ও প্রথম বিভাগ থাকলেই একজন প্রার্থী প্রভাষক হিসেবে আবেদন করতে পারবেন। সমমানের প্রার্থী না পাওয়া গেলে আইন শিথিল করে প্রথম শ্রেণী ও প্রথম বিভাগ না পাওয়া প্রার্থীর আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে। গেল ৩৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন শিথিল করতে করতে আইনগুলো এতটাই শিথিল হয়ে গেছে যে, শিথিল আইনই মূল আইন হয়ে গেছে ক্ষেত্রবিশেষে। কাজেই আইন শিথিল করার এই প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে হবে, তা না হলে দ্বিতীয়/তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ পাওয়া উপাচার্য/বিভাগীয় প্রধান তাদের মতো প্রার্থীকেই অগ্রাধিকার দেবেন। নিকট অতীতে উচ্চতম বিদ্যাপীঠেও অহরহ ঘটেছে এসব ঘটনা। স্বনামধন্য একজন উপাচার্য (তখন উপাচার্য ছিলেন না) নিজের স্ত্রীকে তার বিভাগে ঢুকিয়েছেন আইনের এই শিথিলিকরণের পথ ধরেই। আগের সূত্রে ফিরে যাই। আমার মতে, সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী/বিভাগ পাওয়াটাই নিয়োগ প্রার্থীর যোগ্যতা হওয়া যথেষ্ট নয়। উদাহরণ দিই প্রতিবেশী ভারতের। প্রথম শ্রেণীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রভাষক পদপ্রার্থীকে অবশ্যই পিএইচডি ডিগ্রিধারী তো হতে হবেই, তার সঙ্গে থাকতে হবে আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশনা। আমার জানা মতে, শ্রীলংকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই নীতিমালা পালন করা হয়। ভারতের আইআইটিগুলো আরও একধাপ ওপরে। একজন প্রভাষক পদপ্রার্থীর গবেষণার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করা হয় পোস্ট ডক্টরেল অভিজ্ঞতা, তাও পশ্চিমা জগতের কোন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। হয়তো বলা হবে, ওদের উদাহরণ আমরা পালন করব কেন? আমার উত্তর : মান ধরে রাখতে হলে ওদের মতো হতে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ মনে রাখতে হবে, আজকে যাকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন, আগামী চল্লিশ বছরে তিনি পদোন্নতি পেয়ে পূর্ণ অধ্যাপক হবেন; দলবাজি করলে ভিসি-টিসিও হয়ে যেতে পারেন। কাজেই বিষবৃক্ষ না লাগিয়ে বলবান বৃক্ষ লাগান, জাতি উপকৃত হবে। নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে : একজন প্রভাষক দুই বছর চাকরি করার পর এবং একটিমাত্র প্রকাশনা থাকলে সহকারী অধ্যাপক হওয়ার জন্য যোগ্য হবেন। আমার প্রস্তাব : প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপকে পদোন্নতি পেতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই পিএইচডি ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে কমপক্ষে পাঁচটি প্রকাশনা থাকতে হবে। নীতিমালায় যে একটিমাত্র প্রকাশনা থাকার কথা বলা হয়েছে, তা কোথায় প্রকাশিত হলে গ্রহণযোগ্য হবে তাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি। একজন সহকারী অধ্যাপককে সহযোগী অধ্যাপকে পদোন্নতি পেতে হলে আট বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে পাঁচ বছর হতে হবে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে এবং থাকতে হবে পাঁচটি প্রকাশনা। সময়ের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হলেও মাত্র পাঁচটি প্রকাশনা, যার মান সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি— যথেষ্ট নয়। এই পর্যায়ে পিএইচডি না থাকলেও চলবে বলেই মনে হচ্ছে নীতিমালার খবর দেখে। পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়া একজন সহযোগী অধ্যাপক হয়ে যাবেন, উন্নত দেশে এটা প্রায় অচিন্তনীয়। তবে সত্যেন বোস অথবা স্যার নেভিল মটের মতো কোন ব্যক্তি হলে সেটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য, তারা দু'জনই মাস্টার্স ডিগ্রিধারী ছিলেন।

এরপর আসি সহযোগী অধ্যাপক থেকে পূর্ণ অধ্যাপকে পদোন্নতির ব্যাপারে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা, যার ৭ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ও ১৫টি গবেষণা প্রকাশনা থাকলে একজন পূর্ণ অধ্যাপক হতে পারবেন। ঘুরেফিরে আবারও সেই কথাই ফিরে আসে, এই ১৫টি প্রকাশনা কোন জার্নালে হবে? দলবাজির জার্নাল নাকি আন্তর্জাতিক জার্নাল? নীতিমালায় এটা পরিষ্কার করতে হবে। আমার সম্পূরক প্রশ্ন, একজন অতিমেধাবী শিক্ষক, যার চাকরিকাল ১২ বছর, আন্তর্জাতিক জার্নালে যার ৪০টি প্রকাশনা রয়েছে, যার রয়েছে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা ও পোস্ট ডক্টরেল গবেষণার অভিজ্ঞতা, তার ব্যাপারে ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা কি জরুরি? প্রশ্নটির উত্তর নীতিমালায় থাকতে হবে পরিষ্কার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ১৫ বছর ও বিদেশী একটি প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ বছরেরও অভিজ্ঞতা থেকে আমি কিছু ব্যক্তিগত পরামর্শ দিতে চাই নীতিনির্ধারকদের :

০ নীতিমালায় পরিষ্কার করে বলুন, একজন নতুন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার সময় তার ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল ও যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যিনি ডিগ্রি নিয়েছেন তা কোনভাবেই তার নিয়োগের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যাবে না। এটা বলা একান্তই জরুরি এ জন্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী প্রার্থী কি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ হল যোগ্য মানুষ তৈরি করা, তাদের ছাত্রছাত্রীদের চাকরি দেয়া তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব নয়।

০ যে কোন পদোন্নতির ব্যাপারে প্রতি প্রার্থীর জন্য দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞের লিখিত মতামত চাইতে হবে, মতামতের মূল বিষয়, প্রার্থীর গবেষণা ও প্রকাশনা এবং সম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে প্রার্থীর শিক্ষাদান। এক্ষেত্রে টার্ম শেষে ছাত্রছাত্রীদের মতামত প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শিক্ষক-প্রশাসনে তার অবদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা (যদি থাকে)।

খসড়া নীতিমালার ধারাগুলো পড়ে আমার মনে হচ্ছে, দেশ আরেকটি অটো প্রমোশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের ভবিষ্যতে এক বিরূপ প্রভাব ফেলবে। অটো প্রমোশন সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে কাজ করলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় অচল। কারণ প্রকাশিত নীতিমালা আসল মেধা ও যোগ্যতার মূল্য দেবে না।

পাদটীকা : সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে সার্চ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে যে কমিটি করা হয়েছিল, তার জোরালো প্রতিবাদ করা উচিত ছিল শিক্ষক সমাজের। কোনভাবেই কোন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব থাকবে না এই সার্চ কমিটিতে— তবে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে তিনজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও যুগ্ম সচিবের নিচে নয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (ভোটহীন) এমন একজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হতে পারে। শিক্ষাবিদদের ভোটাধিকার থাকবে, প্রয়োজনে চেয়ারম্যান ভোট দিতে পারেন (কাস্টিং ভোট)।

ড. এসএম মুজিবুর রহমান :